...সে বিষয়ে ... করেন পরিকল্পনা ...
...৯৩ সালের ১৫ এপ্রিল। ...

...। এ পরিকল্পনার মূল ...শ্য—কলকাতা শহরের মূল অঞ্চলসমূহকে ...রমুক্ত করে তা কলকাতার আশেপাশে ছড়িয়ে ... মেরামতি করে চালানো হয়। ...

...টাউনশিপ গড়ে তুলেছে এ পদ্ধতিতে।

তাই কলকাতার উন্নতির জন্য প্রয়োজন এ ধরনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা।

...হরগুলি কি সত্যিই শহর

খাস কলকাতায় তিলধারণের স্থান নেই। শহরতলিতে লোকারণ্য। যেখানে সেখানে নতুন নতুন জনসমষ্টি, ভুঁইফোঁড় শহর। কলকাতার কাছে, কলকাতা থেকে দূরেও। পশ্চিমবঙ্গ নগরায়ণ নিয়ে আলোচনা করছেন

কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত

...টরি টাউন নিউ বোম্বে। বোম্বাই-এর ...চে-পড়া জনসমুদ্র ছড়িয়ে পড়েছে থানে ...য় ও আশেপাশের এক বিস্তৃত অঞ্চলে। ...শহরের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ...লের জনসংখ্যার হার খুবই কমের দিকে, ...গর দশকের চেয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে ...ছে। মূল শহর যেখানে মাত্র ২০ শতাংশ ...ড়ছে সেখানে কল্যাণ প্রায় সাড়ে সাতগুণ ...মিরা ভয়ন্দর প্রায় সাতগুণ বেড়েছে।

...টিই ঔপনিবেশিক যুগে বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও ... কলকাতা ও বোম্বাই শহরের কোনও ...া চলে না। কলকাতার কেন্দ্রীয় শহরের ... অবক্ষয় সত্ত্বেও আমাদের পাওয়া তথ্য ... অন্য কথা। ১৯৮১ থেকে ১৯৯১-এর ...কর মধ্যে এই মহানগরীতে যে জনবৃদ্ধি ...ছে তার প্রায় ৬৩ শতাংশ ঘটেছে কলকাতা ...রেশন এলাকার মধ্যেই। অথচ ...ইয়ের ক্ষেত্রে এই অনুপাত মাত্র ৬১ ...শ। এরকম হল কী করে?

...কথা ঠিক যে, বোম্বাইতে স্থানাভাব যে ... পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে কেন্দ্রীয় শহরের ... আর বাড়া কোনওমতেই সম্ভব নয়। বহুতল বাড়ির উচ্চতা ও সংখ্যা বাড়িয়েও নয়। ১৯৬৪ সালে বৃহত্তর বোম্বাইয়ের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করার সময়েই এ ব্যাপারটি বোঝা গিয়েছিল। ফলে তখন থেকেই বোম্বাইয়ের বিকল্প হিসাবে এমন একটি শহর পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার কথা ভাবা হচ্ছিল যা আরেকটি চুম্বকের মতো শহরপানে ধেয়ে আসা গ্রামীণ জনস্রোতকে টেনে নেবে। ১৯৭০ সালে মহারাষ্ট্র সরকার নতুন বোম্বাই (New Bombay)- এর প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও সমুদ্রের অন্যপারে মহারাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে উপকূল অঞ্চলে একটি যমজ শহর গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। বন্দর গড়ে তোলার কাজও শুরু হয়, তবে একটু দেরিতে। সাম্প্রতিক সেন্সাসে এই 'নিউ বম্বে' বৃহত্তর বোম্বাই-এর অন্তর্গত হয়েছে। ফলে বৃহত্তর বোম্বাই-এর শহরতলি অঞ্চলের জনসংখ্যার অনুপাত দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতের রাজ্যওয়ারি হিসাব নিলে দেখা যাবে মহারাষ্ট্রে নগরায়ণের স্তর সবচেয়ে উঁচু (প্রায় ৩৯ শতাংশ)। অর্থাৎ অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় মহারাষ্ট্রে শহরের বৃদ্ধি বিকাশ সবচেয়ে বেশি ঘটেছে। এই বিচারে একে একে তামিলনাড়ু, গোয়া, গুজরাত, কর্নাটক ও পঞ্জাবের স্থান। এতগুলি রাজ্যের পর আসছে পশ্চিমবঙ্গ। এ রাজ্যে নগরায়ণের স্তর ২৭.৩৯ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতের সামগ্রিক স্তরের উপরে থাকলেও দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে শহরবাসীর অনুপাত কমই। ১৯৮১ সালে রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নগরায়ণের স্তরের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল ষষ্ঠ। ...চ এখন তার স্থান নেমে এসেছে সপ্তমে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের নগরায়ণের স্তর অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কমে গিয়েছে। নগরমনস্ক বলে নিজেকে যে ভাবে, সেই বাঙালির পক্ষে এটি আরেকটি দুঃসংবাদ।

তবে হ্যাঁ, একথা ভাবলে বড় ভুল হবে যে, অনুপাতে তেমন বৃদ্ধি ঘটেনি বলে পশ্চিমবঙ্গের মোট শহরবাসী জনসংখ্যাও কমে গিয়েছে। গত দশকে এ রাজ্যের শহরবাসী জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় বিয়াল্লিশ লক্ষ; অর্থাৎ ১৯৮১র তুলনায় শতকরা ২৮.৯০ ভাগ বৃদ্ধি। গত সেন্সাসের বছরে পশ্চিমবঙ্গে মোট শহরবাসী লোকের সংখ্যা ছিল এক কোটি ছিয়াশি লক্ষ—হয়তো পশ্চিমের কোনও কোনও দেশের মোট জনসংখ্যাই এর চেয়ে কম। কিন্তু দুঃখ হয় জেনে যে, শহরবাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের বিচারে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ত্রয়োদশ। এর আগের দশকেও শহরবাসী জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল ত্রয়োদশ। কিন্তু বৃদ্ধির হার ছিল বেশি; ৩১.৭৩ শতাংশ। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শহরবাসী জনসংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু তেমন দ্রুতগতিতে বাড়ছে না। তুলনায় অন্যান্য রাজ্যে এই বৃদ্ধির হার বেশি। শহরের সংখ্যার দিক থেকে কিন্তু অন্য চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। ভারতে এ বছর ৮৫৬টি নতুন শহর চিহ্নিত করেছেন সেন্সাস কর্তৃপক্ষ। এই নতুন শহরগুলির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মধ্যপ্রদেশে, আর দ্বিতীয় স্থানেই আছে পশ্চিমবঙ্গ।

পর পর দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী প্রবণতার নিশ্চয়ই একটা ন্যায্য ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যদিও প্রমাণগুলি পরোক্ষ, তবু এগুলি থেকে যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় কলকাতা শহরের জনবৃদ্ধির হারে যে ক্রমহ্রাস, তা একপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের নগরচিত্রের পক্ষে ভালই হয়েছে। মহানগরীর দুর্দান্ত বৃদ্ধিতে ভাটা পড়েছে। কিন্তু নতুন নতুন ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছে এ রাজ্যে। তা হলে প্রশ্ন ওঠে এ বছরে নতুন 'শহর' আখ্যা পাওয়া জনবসতিগুলি এ রাজ্যের কোথায় কোথায় গড়ে উঠেছে? জেলার হিসাবে বর্ধমানে নতুন শহরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এর পরে আছে পর পর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও হুগলি। অর্থাৎ এককভাবে দেখলে এখনও বৃহত্তর কলকাতার চারপাশেই নতুন শহরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কলকাতা নগরপিণ্ডের যে প্রবল প্রতাপ তারই এক ভিন্ন ধরনের প্রকাশ ঘটেছে এভাবে; শহরটার কেন্দ্রীয় অংশ তো বাড়তে বাড়তে প্রায় এক সম্পৃক্তির বিন্দুতে পৌঁছেছে তাই সমস্ত বৃদ্ধিটাই এখন ঘটছে শহরতলি অঞ্চলে।

আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গে মোট তিরিশটি নতুন শহর ও নগরপিণ্ডের আবির্ভাব ঘটেছে। এই সংখ্যা, আর যাই হোক, অবহেলা করার মত নয়। সাধারণত জনবসতিগুলি ছোট থেকে একটু একটু করে বড় হতে থাকে। কোনও কোনও শহর আবার এই ধাপগুলি পর পর পেরিয়ে না এসে সরাসরি অপেক্ষাকৃত বড় শহরগুলির শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। অতীতে দুর্গাপুর শহরের ক্ষেত্রে এরকম ঘটতে দেখা গিয়েছে। এ ধরনের হঠাৎ করে বেড়ে ওঠা মাঝারি আয়তনের শহর হল মালদা জেলার মঙ্গলবাড়ি-সমানদাই, উত্তর চব্বিশ পরগনার হাতিয়ারা এবং নদীয়া জেলার মাগুরখালি। একেবারে ছোটো গঞ্জ শহরও অনেকগুলি গড়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃহত্তম শহর, আসানসোল ও দুর্গাপুর। আসানসোল জনপিণ্ডের জনসংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ চৌষট্টি হাজার, তার মধ্যে শুধু আসানসোল পুর এলাকার মধ্যেই রয়েছে দু' লাখ একষট্টি হাজার। গত দশকে অত্যন্ত দ্রুতহারে বৃদ্ধি সত্ত্বেও যে বিষয়টা চোখে পড়ার মত তা হল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর দুটির মধ্যে আয়তনের বিপুল পার্থক্য। কিন্তু মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখুন, দ্বিতীয় শহর পুনেতে প্রায় পঁচিশ লক্ষ, তৃতীয় শহর নাগপুরে প্রায় সতেরো লক্ষ এবং চতুর্থ শহর নাসিকে সাত লক্ষ বাইশ হাজার মানুষের বাস।

কী রকম এই বড় শহরগুলি? ধরুন অণ্ডালের কথা। এই অ্যাগ্লোমারেশনের অন্তর্গত অনেকগুলি ছোট ছোট শহর যাদের নিজস্ব পুর শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে ঢের দেরি আছে। এগুলি শুধুই সেনসাসের বিচারে শহর। সেনসাস এদের শহর নামে ডাকছে এদের আকৃতি ও অর্থনীতির ভিত্তি বিচার করে; জনসংখ্যার আয়তন ও বসতির ঘনত্ব দেখে। স্থানীয় খনিশিল্প ও অন্যান্য অকৃষিমূলক কাজকর্ম এই অঞ্চলে এমন এক প্রভাব ফেলেছে যে গ্রামীণ জনবসতিগুলি তাদের পুরনো চরিত্র বদলে ফেলেছে গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে। এ অঞ্চলের অগুনতি নতুন শহর কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল ছোট ছোট গ্রাম মাত্র।

নগরায়ণের যে বিপুল তরঙ্গ পশ্চিম বর্ধমানে কাজ করছে তার প্রভাব দেখা যায় অণ্ডালের চারপাশে আরও যেসব জনবসতি তাদের গ্রামীণ প্রকৃতি বদলে ফেলছে সতত, সেনসাসে 'আউটগ্রোথ' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, এবং ভবিষ্যতে যাদের শহর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাদের মধ্যে। সমস্ত ভারতেই নগরায়ণের ক্ষেত্রে এই আউটগ্রোথগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। এক বাঙ্গালোর শহরের চারপাশেই রয়েছে ১০৬টি আউটগ্রোথ।

যেখানে মহারাষ্ট্রের মোট নাগরিক জনসংখ্যার ৪১ শতাংশ বাস করেন বৃহত্তর বোম্বাই অঞ্চলে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের শহরবাসী জনসংখ্যার ৫৯ শতাংশ এখনও কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে কলকাতা শহর ও তার আশেপাশের অঞ্চলে। দশ বছর আগে এই অনুপাত ছিল ৬৪ শতাংশ। সুতরাং কলকাতার জনসংখ্যা আগের মতো দ্রুতহারে বাড়ছে না বলেই যে তার প্রাধান্য সম্পূর্ণ খর্ব হয়েছে একথা বলা চলে না। তবে হ্যাঁ, ঘোরতর কলকাতাপ্রেমীও মানতে বাধ্যহবেন যে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিককালে আরও বেশ কয়েকটি বড় শহর গড়ে উঠেছে। সৃষ্টি হয়েছে দুর্গাপুর, রানিগঞ্জ, আসানসোল হয়ে কুলটি-বরাকর ও চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত বিস্তৃত এক নগর এলাকার। যেমন করে তিনটি রাজ্যের উপরে ছড়িয়ে আছে রাজধানী দিল্লির নগরাঞ্চল, তেমন করে স্থানীয় রাজনৈতিক সীমানা অগ্রাহ্য করে অদূর ভবিষ্যতে এই এলাকা ছড়িয়ে পড়তে পারে পশ্চিমে ধানবাদ-বোকারো-সিন্ধ্রি থেকে পূর্বে বর্ধমান-মেমারি পর্যন্ত। তার কিছুদিনের মধ্যেই বর্ধমান-মেমারি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বৃহত্তর কলকাতার অংশ ব্যাণ্ডেল-চুঁচুড়া-শ্রীরামপুরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যেতে পারে। এভাবে তৈরি হবে কলকাতা থেকে বিহারের ধানবাদ-বোকারো পর্যন্ত বিস্তৃত একটানা এক নগরায়িত পথ, ইংরেজিতে যাকে বলে 'আর্বান করিডোর'।

কলকাতার মেট্রোপলিস ধীরে হলেও বাড়তে বাড়তে প্রায় এক 'মেগালোপলিসে' পরিণত হয়েছে। এই বিস্তীর্ণ নগরায়িত অঞ্চলে অনেকগুলি বড় শহর যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত যে তারা তৈরি করেছে সুবিশাল এক অখণ্ড নগরব্যবস্থা। রাজ্যের বাকি অংশের তুলনায় এই মেগালোপলিস অঞ্চলের বহির্কাঠামো অনেক বেশি উন্নত বলে তাদের আকর্ষণে এখনও বেশ কিছুদিন কলকাতার চারপাশে উন্নত স্তরের অর্থনৈতিক কাজকর্মগুলি জড় হতে থাকবে। একে এক ধরনের ভৌগোলিক স্থিতিজাড্য বলা চলে। এই স্থিতি জাড্যই কলকাতা শহরকে বাড়িয়ে চলেছে গত কয়েক দশক ধরে, ভবিষ্যতে বাড়িয়ে চলবে অন্তত আরও কয়েক দশক।

...বং সেতুর অন্য তীরে আর এক ... শহর : হাওড়া

সাহেবদের মধ্যে ছিল। সম্ভবত স্বল্প... পর্যন্ত উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাঙালিরও ... ছিল। এমনকি এখনও লক্ষ্মীকান্তপুর ... আসা বৃদ্ধা পরিচারিকার গড়িয়াহাট দেখে চমক লাগে। সুদূর উত্তরবঙ্গে কর্মরত একটি যুবকের কলকাতার 'গ্যাঞ্জাম্' ভাল লাগে। কে কীভাবে দেখে থাকে সৌমেনবাবু 'ইমেজেস্' বলছেন—তাও ইতিহাসের বিষয়বস্তু। হয়তো কোনও এক সময় কল্পনার সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর কলকাতার ইতিহাস রচিত হবে। অথচ তা করতে গিয়ে তথ্যের বিকৃতি হবে না।

কল্পনার ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য আধুনিক জগতে অনেক উপাদান আছে, যেমন: কম্পিউটার। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়টি নতুন লেখা। ১৮০৬ থেকে ১৮৫২ পর্যন্ত 'ঘরদোর' এবং তার আধিকারিকদের ওপর। ইতিপূর্বে কেউ কলকাতার ইতিহাস আলোচনায় কম্পিউটার ব্যবহার করেননি। সে দিক থেকে এই অধ্যায়টিকে সম্পূর্ণ নতুন বলার যৌক্তিকতা আছে। আর 'ক্লিউমেট্রিকস্' তো এখন পাণ্ডিত্যের জগতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। আশা করি লেখক এ দিকে আরও নজর দেবেন।

'বাংলাভাষা ও সাহিত্যে ভদ্রলোক' প্রবন্ধে লেখক 'ভদ্রলোক' এবং 'বাবু' শব্দ দুইটির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত 'বাবু' শব্দটি সমৃদ্ধি এবং সামাজিক মর্যাদার সূচক ছিল। 'ভদ্রলোক' শব্দটির মধ্যে সম্ভবত উচ্চবর্ণজাত শিষ্টাচার, সংস্কৃতির এবং শিক্ষার এক জটিল মিশ্রণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই 'ভদ্রলোক' ব্যাপারটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। আমরা আমাদের বাল্যকালে বিশেষ করে দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত এই 'ভদ্রলোক' শব্দের বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি অনুসারে ব্যবহার শুনেছি। শুধু ধনী লোক 'ভদ্রলোক' নাও হতে পারত এমন সম্ভাবনা ছিল। উনিশ শতকের শেষ থেকে 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত' যখন তাঁদের অস্তিত্ব নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, তখন সাহেবরা 'ভদ্রলোক' এবং 'বাবু' শব্দটির ওপর জোর দিতে থাকেন এবং সেখানে এক ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। 'বাবু' শব্দটি বেশ কিছু শিক্ষিত বাঙালি অপছন্দ করতেন। রমেশচন্দ্র দত্ত বা উমেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে বাবু বলা যেত না তবে বঙ্কিমচন্দ্রকে মিস্টার বঙ্কিম না বলে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলা যেত। এবং বঙ্কিমচন্দ্রও তার শোধ নিয়েছেন তাঁর 'বাবু' রহস্যরচনায়। তার মধ্যে আজকালকার সমালোচকরা এক ধরনের 'অন্তর্মুখী উৎপীড়ন'-এর সন্ধান পেতে পারেন।

'কলকাতার ভাষা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আদিপর্ব থেকেই কলকাতায় বেশ কয়টি ভাষা প্রচলিত ছিল। কোম্পানির কর্মচারী এবং শহরবাসীদের মধ্যে ব্যবসায়িক আদানপ্রদানের মৌখিক-ভাষা ছিল সাধারণভাবে পর্তুগিজ। ১৭৭৮ সালে হ্যালহেড আরও চারটি ভাষার উল্লেখ করেন যা তদানীন্তন বাংলাদেশে এবং কলকাতা শহরে প্রচলিত ছিল— সংস্কৃত, ফার্সি, হিন্দুস্থানি এবং মুর অর্থাৎ উর্দু। অবশ্য কলকাতার জনসংখ্যার বড় অংশ ছিল প্রথম থেকেই বাংলা

এরপর এগারোর পাতায়

[শ]হরগুলি কি সত্যিই শহর

খাস কলকাতায় তিলধারণের স্থান নেই। শহরতলিতে লোকারণ্য। যেখানে সেখানে নতুন নতুন জনসমষ্টি, ভুঁইফোঁড় শহর। কলকাতার কাছে, কলকাতা থেকে দূরেও। পশ্চিমবঙ্গ নগরায়ণ নিয়ে আলোচনা করছেন

কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত

[শা]টেলাইট] টাউন নিউ বোম্বে। বোম্বাই-এর [ঘিঞ্জি ঘেঁ]ষে-পড়া জনসমুদ্র ছড়িয়ে পড়েছে থানে [জেলায়] ও আশেপাশের এক বিস্তৃত অঞ্চলে। [কলকাতা] শহরের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় [অঞ্চ]লের জনসংখ্যার হার খুবই কমের দিকে, [আগের] দশকের চেয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে [গি]য়েছে। মূল শহর যেখানে মাত্র ২০ শতাংশ [বে]ড়েছে সেখানে কল্যাণ প্রায় সাড়ে সাতগুণ [আর] মিরা ভয়ন্দর প্রায় সাতগুণ বেড়েছে।

[দু]টিই ঔপনিবেশিক যুগে বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও [...] কলকাতা ও বোম্বাই শহরের কোনও [তুলনা] চলে না। কলকাতার কেন্দ্রীয় শহরের [...] অবক্ষয় সত্ত্বেও আমাদের পাওয়া তথ্য [কিন্তু] অন্য কথা। ১৯৮১ থেকে ১৯৯১-এর [দশ]কের মধ্যে এই মহানগরীতে যে জনবৃদ্ধি [ঘটে]ছে তার প্রায় ৬৩ শতাংশ ঘটেছে কলকাতা [কর্পো]রেশন এলাকার মধ্যেই। অথচ [বোম্বা]ইয়ের ক্ষেত্রে এই অনুপাত মাত্র ৬১ [শতাং]শ। এরকম হল কী করে ?

[এ]কথা ঠিক যে, বোম্বাইতে স্থানাভাব যে [...] পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে কেন্দ্রীয় শহরের [...] আর বাড়া কোনওমতেই সম্ভব নয়। বহুতল বাড়ির উচ্চতা ও সংখ্যা বাড়িয়েও নয়। ১৯৬৪ সালে বৃহত্তর বোম্বাইয়ের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করার সময়েই এ ব্যাপারটি বোঝা গিয়েছিল। ফলে তখন থেকেই বোম্বাইয়ের বিকল্প হিসাবে এমন একটি শহর পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার কথা ভাবা হচ্ছিল যা আরেকটি চুম্বকের মতো শহরপানে ধেয়ে আসা গ্রামীণ জনস্রোতকে টেনে নেবে। ১৯৭০ সালে মহারাষ্ট্র সরকার নতুন বোম্বাই (New Bombay)- এর প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও সমুদ্রের অন্যপারে মহারাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডের উপকূল অঞ্চলে একটি যমজ শহর গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। বন্দর গড়ে তোলার কাজও শুরু হয়, তবে একটু দেরিতে। সাম্প্রতিক সেন্সাসে এই 'নিউ বম্বে' বৃহত্তর বোম্বাই-এর অন্তর্গত হয়েছে। ফলে বৃহত্তর বোম্বাই-এর শহরতলি অঞ্চলের জনসংখ্যার অনুপাত দারুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতের রাজ্যওয়ারি হিসাব নিলে দেখা যাবে মহারাষ্ট্রে নগরায়ণের স্তর সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৩৯ শতাংশ)। অর্থাৎ অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় মহারাষ্ট্রে শহরের বৃদ্ধি [বিকাশ] সবচেয়ে বেশি ঘটেছে। এই বিচারে [এরপর] একে একে তামিলনাড়ু, গোয়া, গুজরাত, [কর্ণা]টক ও পঞ্জাবের স্থান। এতগুলি রাজ্যের [পর] আসছে পশ্চিমবঙ্গ। এ রাজ্যে নগ্‌রায়ণের [স্ত]র ২৭.৩৯ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতের [সাম]গ্রিক স্তরের উপরে থাকলেও দেশের বেশ [কয়ে]কটি রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে [শহর]বাসীর অনুপাত কমই। ১৯৮১ সালে [রাজ্য]গুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নগরায়ণের [স্ত]রের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল ষষ্ঠ। [আ]র এখন তার স্থান নেমে এসেছে সপ্তমে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের নগরায়ণের স্তর অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কমে গিয়েছে। নগরমনস্ক বলে নিজেকে যে ভাবে, সেই বাঙালির পক্ষে এটি [আ]রেকটি দুঃসংবাদ।

[ত]বে হ্যাঁ, একথা ভাবলে বড় ভুল হবে যে, [অনু]পাতে তেমন বৃদ্ধি ঘটেনি বলে পশ্চিমবঙ্গের [মোট] শহরবাসী জনসংখ্যাও কমে গিয়েছে। [গত] দশকে এ রাজ্যের শহরবাসী জনসংখ্যা [বেড়ে]ছে প্রায় বিয়াল্লিশ লক্ষ ; অর্থাৎ ১৯৮১র [তুল]নায় শতকরা ২৮.৯০ ভাগ বৃদ্ধি। গত [সেন্]সাসের বছরে পশ্চিমবঙ্গে মোট শহরবাসী [লো]কের সংখ্যা ছিল এক কোটি ছিয়াশি [লক্ষ]—হয়তো পশ্চিমের কোনও কোনও [দেশের] মোট জনসংখ্যাই এর চেয়ে কম। কিন্তু [অবাক] হয় জেনে যে, শহরবাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধির [হারের] বিচারে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ত্রয়োদশ। এর আগের দশকেও শহরবাসী জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল ত্রয়োদশ। কিন্তু বৃদ্ধির হার ছিল বেশি ; ৩১.৭৩ শতাংশ। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শহরবাসী জনসংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু তেমন দ্রুতগতিতে বাড়ছে না। তুলনায় অন্যান্য রাজ্যে এই বৃদ্ধির হার বেশি। শহরের সংখ্যার দিক থেকে কিন্তু অন্য চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। ভারতে এ বছর ৮৫৬টি নতুন শহর চিহ্নিত করেছেন সেন্সাস কর্তৃপক্ষ। এই নতুন শহরগুলির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মধ্যপ্রদেশে, আর দ্বিতীয় স্থানেই আছে পশ্চিমবঙ্গ।

পর পর দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী প্রবণতার নিশ্চয়ই একটা ন্যায্য ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যদিও প্রমাণগুলি পরোক্ষ, তবু এগুলি থেকে যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় কলকাতা শহরের জনবৃদ্ধির হারে যে ক্রমহ্রাস, তা একপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের নগরচিত্রের পক্ষে ভালই হয়েছে। মহানগরীর দুর্দান্ত বৃদ্ধিতে ভাটা পড়েছে। কিন্তু নতুন নতুন ছোট ছোট শহর গড়ে উঠেছে এ রাজ্যে। তা হলে প্রশ্ন ওঠে এ বছরে নতুন 'শহর' আখ্যা পাওয়া জনবসতিগুলি এ রাজ্যের কোথায় কোথায় গড়ে উঠেছে ? জেলার হিসাবে বর্ধমানে নতুন শহরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এর পরে আছে পর পর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও হুগলি। অর্থাৎ এককভাবে দেখলে এখনও বৃহত্তর কলকাতার চারপাশেই নতুন শহরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কলকাতা নগরপিণ্ডের যে প্রবল প্রতাপ তারই এক ভিন্ন ধরনের প্রকাশ ঘটেছে এভাবে ; শহরটার কেন্দ্রীয় অংশ তো বাড়তে বাড়তে প্রায় এক সম্পৃক্তির বিন্দুতে পৌঁছেছে তাই সমস্ত বৃদ্ধিটাই এখন ঘটছে শহরতলি অঞ্চলে।

আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গে মোট তিরিশটি নতুন শহর ও নগরপিণ্ডের আবির্ভাব ঘটেছে। এই সংখ্যা, আর যাই হোক, অবহেলা করার মত নয়। সাধারণত জনবসতিগুলি ছোট থেকে একটু একটু করে বড় হতে থাকে। কোনও কোনও শহর আবার এই ধাপগুলি পর পর পেরিয়ে না এসে সরাসরি অপেক্ষাকৃত বড় শহরগুলির শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। অতীতে দুর্গাপুর শহরের ক্ষেত্রে এরকম ঘটতে দেখা গিয়েছে। এ ধরনের হঠাৎ করে বেড়ে ওঠা মাঝারি আয়তনের শহর হল মালদা জেলার মঙ্গলবাড়ি-সমানদাই, উত্তর চব্বিশ পরগনার হাতিয়ারা এবং নদীয়া জেলার মাগুরখালি। একেবারে ছোটো গঞ্জ শহরও অনেকগুলি গড়ে উঠেছে।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৃহত্তম শহর, আসানসোল ও দুর্গাপুর। আসানসোল জনপিণ্ডের জনসংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ চৌষট্টি হাজার, তার মধ্যে শুধু আসানসোল পুর এলাকার মধ্যেই রয়েছে দু' লাখ একষট্টি হাজার। গত দশকে অত্যন্ত দ্রুতহারে বৃদ্ধি সত্ত্বেও যে বিষয়টা চোখে পড়ার মত তা হল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর দুটির মধ্যে আয়তনের বিপুল পার্থক্য। কিন্তু মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখুন, দ্বিতীয় শহর পুনেতে প্রায় পঁচিশ লক্ষ, তৃতীয় শহর নাগপুরে প্রায় সতেরো লক্ষ এবং চতুর্থ শহর নাসিকে সাত লক্ষ বাইশ হাজার মানুষের বাস।

কী রকম এই বড় শহরগুলি ? ধরুন

অণ্ডালের কথা। এই অ্যাগ্লোমারেশনের অন্তর্গত অনেকগুলি ছোট ছোট শহর যাদের নিজস্ব পুর শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে ঢের দেরি আছে। এগুলি শুধুই সেনসাসের বিচারে শহর। সেনসাস এদের শহর নামে ডাকছে এদের আকৃতি ও অর্থনীতির ভিত্তি বিচার করে ; জনসংখ্যার আয়তন ও বসতির ঘনত্ব দেখে। স্থানীয় খনিশিল্প ও অন্যান্য অকৃষিমূলক কাজকর্ম এই অঞ্চলে এমন এক প্রভাব ফেলেছে যে গ্রামীণ জনবসতিগুলি তাদের পুরনো চরিত্র বদলে ফেলেছে গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে। এ অঞ্চলের অগুনতি নতুন শহর কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল ছোট ছোট গ্রাম মাত্র।

নগরায়ণের যে বিপুল তরঙ্গ পশ্চিম বর্ধমানে কাজ করছে তার প্রভাব দেখা যায় অণ্ডালের চারপাশে আরও যেসব জনবসতি তাদের গ্রামীণ প্রকৃতি বদলে ফেলছে সতত, সেনসাসে 'আউটগ্রোথ' হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, এবং ভবিষ্যতে যাদের শহর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাদের মধ্যে। সমস্ত ভারতেই নগরায়ণের ক্ষেত্রে এই আউটগ্রোথগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। এক বাঙ্গালোর শহরের চারপাশেই রয়েছে ১০৬টি আউটগ্রোথ।

যেখানে মহারাষ্ট্রের মোট নাগরিক জনসংখ্যার ৪১ শতাংশ বাস করেন বৃহত্তর বোম্বাই অঞ্চলে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের শহরবাসী জনসংখ্যার ৫৯ শতাংশ এখনও কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে কলকাতা শহর ও তার আশেপাশের অঞ্চলে। দশ বছর আগে এই অনুপাত ছিল ৬৪ শতাংশ। সুতরাং কলকাতার জনসংখ্যা আগের মতো দ্রুতহারে বাড়ছে না বলেই যে তার প্রাধান্য সম্পূর্ণ খর্ব হয়েছে একথা বলা চলে না। তবে হ্যা, ঘোরতর কলকাতাপ্রেমীও মানতে বাধ্যহবেন যে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিককালে আরও বেশ কয়েকটি বড় শহর গড়ে উঠেছে। সৃষ্টি হয়েছে দুর্গাপুর, রানিগঞ্জ, আসানসোল হয়ে কুলটি-বরাকর ও চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত বিস্তৃত এক নগর এলাকার। যেমন করে তিনটি রাজ্যের উপরে ছড়িয়ে আছে রাজধানী দিল্লির নগরাঞ্চল, তেমন করে স্থানীয় রাজনৈতিক সীমানা অগ্রাহ্য করে অদূর ভবিষ্যতে এই এলাকা ছড়িয়ে পড়তে পারে পশ্চিমে ধানবাদ-বোকারো-সিন্ধ্রি থেকে পূর্বে বর্ধমান-মেমারি পর্যন্ত। তার কিছুদিনের মধ্যেই বর্ধমান-মেমারি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বৃহত্তর কলকাতার অংশ ব্যাণ্ডেল-চুঁচুড়া-শ্রীরামপুরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যেতে পারে। এভাবে তৈরি হবে কলকাতা থেকে বিহারের ধানবাদ-বোকারো পর্যন্ত বিস্তৃত একটানা এক নগরায়িত পথ, ইংরেজিতে যাকে বলে 'আর্বান করিডোর'।

কলকাতার মেট্রোপলিস ধীরে হলেও বাড়তে বাড়তে প্রায় এক 'মেগালোপলিসে' পরিণত হয়েছে। এই বিস্তীর্ণ নগরায়িত অঞ্চলে অনেকগুলি বড় শহর যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত যে তারা তৈরি করেছে সুবিশাল এক অখণ্ড নগরব্যবস্থা। রাজ্যের বাকি অংশের তুলনায় এই মেগালোপলিস অঞ্চলের বহির্কাঠামো অনেক বেশি উন্নত বলে তাদের আকর্ষণে এখনও বেশ কিছুদিন কলকাতার চারপাশে উন্নত স্তরের অর্থনৈতিক কাজকর্মগুলি জড় হতে থাকবে। একে এক ধরনের ভৌগোলিক স্থিতিজাড্য বলা চলে। এই স্থিতি জাড্যই কলকাতা শহরকে বাড়িয়ে চলেছে গত কয়েক দশক ধরে, ভবিষ্যতে বাড়িয়ে চলবে অন্তত আরও কয়েক দশক।

[...] সেতুর অন্য তীরে আর এক দুঃস্বপ্নের শহর : হাওড়া

[...]লেন। এ পরিকল্পনার মূল [লক্ষ]্য—কলকাতা শহরের মূল অঞ্চলসমূহকে [ভা]রমুক্ত করে তা কলকাতার আশেপাশে ছড়িয়ে [...] মেরামতি করে চালানো হয়। [...]

[...] ফরিদাবাদ থেকে শুরু করে অসংখ্য টাউনশিপ গড়ে তুলেছে এ পদ্ধতিতে।

তাই কলকাতার উন্নতির জন্য প্রয়োজন এ ধরনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা।

সাহেবদের মধ্যে ছিল। সম্ভবত [...] পর্যন্ত উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাঙালিরও [...] ছিল। এমনকি এখনও লক্ষ্মীকান্তপুর [...] আসা বৃদ্ধা পরিচারিকার গড়িয়াহাট দেখে চমক লাগে। সুদূর উত্তরবঙ্গে কর্মরত একটি যুবকের কলকাতার 'গ্যাঞ্জাম্' ভাল লাগে। কে কীভাবে দেখে থাকে সৌমেনবাবু 'ইমেজেস্' বলছেন— তাও ইতিহাসের বিষয়বস্তু। হয়তো কোনও এক সময় কল্পনার সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর কলকাতার ইতিহাস রচিত হবে। অথচ তা করতে গিয়ে তথ্যের বিকৃতি হবে না।

কল্পনার ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য আধুনিক জগতে অনেক উপাদান আছে, যেমন : কম্পিউটার। গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়টি নতুন লেখা। ১৮০৬ থেকে ১৮৫২ পর্যন্ত 'ঘরগ্লোর' এবং তার আধিকারিকদের ওপর। ইতিপূর্বে কেউ কলকাতার ইতিহাস আলোচনায় কম্পিউটার ব্যবহার করেননি। সে দিক থেকে এই অধ্যায়টিকে সম্পূর্ণ নতুন বলার যৌক্তিকতা আছে। আর 'ক্লিউমেট্রিকস্' তো এখন পাণ্ডিত্যের জগতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। আশা করি লেখক এ দিকে আরও নজর দেবেন।

'বাংলাভাষা ও সাহিত্যে ভদ্রলোক' প্রবন্ধে লেখক 'ভদ্রলোক' এবং 'বাবু' শব্দ দুইটির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত 'বাবু' শব্দটি সমৃদ্ধি এবং সামাজিক মর্যাদার সূচক ছিল। 'ভদ্রলোক' শব্দটির মধ্যে সম্ভবত উচ্চবর্ণজাত শিষ্টাচার, সংস্কৃতির এবং শিক্ষার এক জটিল মিশ্রণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই 'ভদ্রলোক' ব্যাপারটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। আমরা আমাদের বাল্যকালে বিশেষ করে দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত ঐই 'ভদ্রলোক' শব্দের বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি অনুসারে ব্যবহার শুনেছি। শুধু ধনী লোক 'ভদ্রলোক' নাও হতে পারত এমন সম্ভাবনা ছিল। উনিশ শতকের শেষ থেকে 'শিক্ষিত মধ্যবিত্ত' যখন তাঁদের অস্তিত্ব নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, তখন সাহেবরা 'ভদ্রলোক' এবং 'বাবু' শব্দটির ওপর জোর দিতে থাকেন এবং সেখানে এক ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। 'বাবু' শব্দটি বেশ কিছু শিক্ষিত বাঙালি অপছন্দ করতেন। রমেশচন্দ্র দত্ত বা উমেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে বাবু বলা যেত না তবে বঙ্কিমচন্দ্রকে মিস্টার বঙ্কিম না বলে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলা যেত। এবং বঙ্কিমচন্দ্রও তার শোধ নিয়েছেন তাঁর 'বাবু' রহস্যরচনায়। তার মধ্যে আজকালকার সমালোচকরা এক ধরনের 'অন্তর্মুখী উৎপীড়ন'-এর সন্ধান পেতে পারেন।

'কলকাতার ভাষা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আদিপর্ব থেকেই কলকাতায় বেশ কয়টি ভাষা প্রচলিত ছিল। কোম্পানির কর্মচারী এবং শহরবাসীদের মধ্যে ব্যবসায়িক আদানপ্রদানের মৌখিক-ভাষা ছিল সাধারণভাবে পর্তুগিজ। ১৭৭৮ সালে হ্যালহেড আরও চারটি ভাষার উল্লেখ করেন যা তদানীন্তন বাংলাদেশে এবং কলকাতা শহরে প্রচলিত ছিল— সংস্কৃত, ফার্সি, হিন্দুস্থানি এবং মূর অর্থাৎ উর্দু। অবশ্য কলকাতার জনসংখ্যার বড় অংশ ছিল প্রথম থেকেই বাংলা

এরপর এগারোর পাতায়

এক বিচিত্র নদ

কুন্তলা লাহিড়ি

দামোদর এক আশ্চর্য নদ। নামেই প্রকাশ, এ নদীর মত কমনীয় ও লালিত্যময় নয়, বরং দুর্দান্ত পৌরুষে ভরপুর। অবিশ্রান্ত বর্ষণে ফুলে-ফেঁপে ওঠা দামোদরের কিন্তু আরও একটা রূপ আমরা দেখি শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে, যখন তা পরিণত হয় ক্ষীণকায় এক ম্রিয়মাণ জলধারায়। ঘন বর্ষার রাতে যার উদ্দাম জলরাশি পার হবার সাহস রাখে মাত্র দুয়েকটি মানুষ, গ্রীষ্মে তারই হাঁটুজল ভেঙে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায় মানুষ—পশু নির্বিশেষে। ভয়ংকর ও শান্ত এই দুই পরস্পর-বিরোধী ছবি এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে কেবল দামোদরই।

দামোদর জাগিয়ে তোলে মনের মধ্যে নানা পরস্পরবিরোধী আবেগ। 'ধ্বংসের নদ', 'দুঃখের নদ'—এই পরিচয়ে তাকে জেনে ভয় পাই, মনে দেখা দেয় নানা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া। আবার সেই দামোদরই গ্রামে গ্রামে আনন্দের সাড়া তোলে যখন মঙ্গলের স্মারক হিসেবে বয়ে আসে দামোদরের খালের জল। শহরে শহরে জ্বলে ওঠে দামোদরের কল্যাণে পাওয়া বিদ্যুতের আলো, যেন তাকে দীপাবলীর অর্ঘ সাজিয়ে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যেই। একদিকে ধ্বংস ও সংহার, অন্যদিকে সৃষ্টি ও পালন—দামোদরের এই দ্বৈত ভূমিকা আমাদের নাড়া দেয়, আপ্লুত করে আবেগে।

এ এক এমন নদ যাকে ঠিক একটা বিশেষণে ভূষিত করা চলে না, যার জন্যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বর্ণনাই যথেষ্ট নয়। দামোদর যেন বৈচিত্রের প্রতীক। এ নাম অবহেলাভরে শুনে অগ্রাহ্য করা যায় না, সজাগ হয়ে নড়েচড়ে বসতেই হয়। শুধু ভারত নয়, সত্যি কথা বলতে কি, গোটা পৃথিবীর অতি অল্পসংখ্যক নদ-নদীর ক্ষেত্রে এই কথা বলা চলে। অন্যান্য যেসব নদী এরকম আবেগ জাগায় মানুষের মনে, তারা প্রত্যেকেই আয়তনে অনেক বড়, নিজের নিজের দেশের প্রধান নদী তারা। আমাদের দামোদর তো সেই তুলনায় নেহাতই বামন।

দামোদরের এও আরেক আশ্চর্য দিক। দৈর্ঘ্যে নিতান্তই ছোট এই নদী, উৎস থেকে মোহানা পর্যন্ত মাত্র পাঁচশ চল্লিশ কিলোমিটার।নদীমাতৃক ভারতের বিপুলায়তন গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র মহানদী গোদাবরীদের কাছাকাছি আসে না দামোদর। ছোটনাগপুরের মালভূমির ১০৬৭ মিটার উঁচু খামারপত ও বীরজংগা পাহাড়ের বৃষ্টির জল সৃষ্টি করেছে একটি শীর্ণকায় ঝরণার। এই ঝরণার স্থানীয় নাম 'সোনাসাথী'। এরকম আরও অসংখ্য নদী ও ঝরণা ক্রমশ একসঙ্গে মিলিত হতে হতে সৃষ্টি করেছে যে নদীর তার স্থানীয় নাম 'দেওনদ্'। হিন্দুদের যেমন গঙ্গা, খ্রিস্টানদের জর্ডান—ছোটনাগপুরের আদিবাসী উপজাতিদের চোখে এই নদীটিও তেমনি পবিত্র। হাজারিবাগ জেলায় পৌঁছে এর নাম হয়েছে দামোদর। নামটি কীভাবে এসেছে তাই নিয়েও নানারকম মত আছে। কেউ কেউ বলেন 'দাম' ও 'উদর' এই দুটি শব্দের সন্ধি করে নাম হয়েছে 'দামোদর'। গ্রীষ্মকালে নদীখাতে যখন জল প্রায় থাকে না, তখন গজিয়ে ওঠে অজস্র দাম বা জলজ

গ্রীষ্মের দামোদর অনায়াসে পার হয়ে যায় গরুর পাল